তারিখ 15 SEP 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মেডিক্যালে ভর্তির নিয়ম এবং আমাদের ভাগ্য

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়া খুব কঠিন ও প্রতিযোগিতামূলক। এজন্য অনেক ছেলেমেয়ে ছোটবেলা থেকেই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। তবুও যারা ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না বা চান্স পায় না সে দুঃখ ভিন্ন রকম।

কিন্তু ভর্তি কর্তৃপক্ষের শুধুমাত্র একটি বর্ষের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ যোগ্যতা চাওয়া আমরা মনে করি আমাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণ ও অধিকার খর্ব করার শামিল।

আমরা যারা ১৯৮৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছি এবং যে কারণেই হোক এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ না পেয়ে একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছি তারা গতবার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাইনি। অথচ ১৯৮৭ সালের আগে বা এখন নিয়ম হচ্ছে যে, উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগসহ সর্বমোট ১২০০ নম্বর পেলে (নিয়মিতদের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারা যাবে।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, শুধুমাত্র আমরা যে বার পাস করলাম সে বারের জন্যই দুই পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ চাওয়া হলো। তাই যদি হবে তবে আমাদের ব্যাচে ছেলেমেয়েরা যারা আজীবন মেডিক্যাল পড়াশোনার স্বপ্ন দেখেছি তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভর্তি কমিটির খেয়ালখুশীমত নতুন নিয়ম করার জন্য সব কিছু শেষ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটি তুচ্ছ হলেও আমাদের জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আর একটি বিষয় যেটি হয়তো কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে থাকবে যে, যারা ১৯৮৭ সালে এইচ, এস, সি পাস করেছে এবং ১২২৫ নম্বর পেয়েছে এক বছর নষ্ট করে হলেও এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। কিন্তু সবসময়ই নিয়মিত ব্যাচের ছাত্ররা ১২০০ নম্বর পেলেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে পেরেছে। তাই যদি হবে তবে আমরা যারা ১৯৮৭ সালে ১২০০ থেকে ১২২৪ নম্বর পেয়েছি (১টি ১ম বিভাগ, অন্যটি ২য় বিভাগসহ) তারা কোন্ অদৃষ্টের কারণে এক বারের জন্য হলেও মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাব না। ১৯৮৭ সালে এইচ,এস,সি পাস করা ছাত্রদের মেডিক্যালে ভর্তি কর্তৃপক্ষ কি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন? কিংবা তাদের শিক্ষার মানকে কর্তৃপক্ষ অন্য সব সময়ের মানের সমান বলে মনে করতে পারেন না, যার জন্য আমাদের বেলায় ভিন্ন নিয়ম (?) তৈরী করতে হল।

সে যাই হোক, গতবার যা হয়েছে তা আমরা আমাদের ভাগ্য হিসেবেই মেনে নিচ্ছি। তবে এবার যেন আমরা যারা ১৯৮৭ সালে ১২০০ থেকে ১২২৪ নম্বর পেয়েছি যুক্তিসংগত অধিকারের কারণেই কর্তৃপক্ষ আমাদের নম্বর থেকে ২৫ নম্বর না কেটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেন।

সবশেষে মেডিক্যালে ভর্তি কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, আপনারা যেন সার্বজনীন দীর্ঘদিনের জন্য ভর্তি নিয়ম চালু করেন (যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি)। এতে করে আগামী দিনের ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের প্রতি বছরের নতুন নতুন পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে সুস্থ মনে প্রস্তুতি নিতে পারবে। এতে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তবে সে একে অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত অদৃষ্টকে মেনে নিতে পারবে।

—জনৈক ভর্তিচ্ছু

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ কেন?

ক্ষমতার অপব্যবহারের এক চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ। যার ফলশ্রুতিতে কোন যুক্তিসংগত কারণ না দেখিয়ে ইন্সটিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (৮ই সেপ্টেম্বর, '৮৮) এবং মাত্র তিন ঘন্টার নোটিশে হলসমূহ খালি করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে এমন এক দুঃসময়ে যখন সারাদেশ বন্যাকবলিত, সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কর্তৃপক্ষ জানেন দূর-দূরান্তের ছেলেদের বাড়ী যাবার মত কোন রকম যোগাযোগ ব্যবস্থাই চালু নেই, তবু তারা পুলিশ দিয়ে অমানবিকভাবে ছাত্রদেরকে বৃষ্টির মধ্যে হল থেকে বের করে দেয়। অনেকের কাছেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। সে জন্য আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত ১৮-৮-৮৮ তারিখে ইন্সটিটিউটের দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কথা কাটাকাটি এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে গড়ায় এবং একটি সংগঠনের ছাত্রদের হাতে অন্য একটি সংগঠনের ছাত্র প্রহৃত হয়, যা নেহাত চড়-থাপ্পড়ের ঘটনা। সেই ছাত্র তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে এবং কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত কমিটি গঠন ছাড়াই পূর্ববর্তী ছাত্র সংগঠনের ছ'জনের নামে ৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দাবী করে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ জারি করে এবং ত্বরিৎ সিদ্ধান্তে দু'জন ছাত্রকে টি,সি প্রদান করে। রাতের অন্ধকারে এই নোটিশ প্রদান করে কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে এবং ছুটি গ্রহণ না করে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নিজ নিজ গ্রামের বাড়ী চলে যান। ফলে পরবর্তী দু'দিন ইন্সটিটিউটে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্ররা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় এবং ৩২৫জন ছাত্র (যা মোট ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী) স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপিতে অধ্যক্ষের কাছে তদন্ত কমিটি গঠন করে পুনঃ বিচারের দাবী জানায়। এতে কর্তৃপক্ষ সমাবেশ, মিছিলসহ সব রকম রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কর্তৃপক্ষের এরূপ আচরণে ১৩৭ জন ছাত্র টি'সি'র নিয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং টি, সির জন্য আবেদন জানায় যার অনুলিপি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ শিক্ষা মন্ত্রী এবং অন্যান্যের কাছে পাঠানো হয়। এতেও কর্তৃপক্ষ কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে ইন্সটিটিউট বন্ধ করে দেয়ার বিভিন্ন চেষ্টা চালাতে থাকেন। এক পর্যায় 'কারণ দর্শাও' নোটিশ পাওয়া একজন ছাত্রকে অভিযোগকারী সংগঠনের ছাত্ররা আক্রমণ করে এবং মাথার ৫টি সেলাই নিয়ে ছাত্রটি কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য, উত্তেজনা সৃষ্টি করে ইন্সটিটিউট বন্ধ ঘোষণা করা, যার ফলশ্রুতিতে ক্যাম্পাসে ছাত্র থাকবে না এবং সম্পূর্ণ ঘটনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। সাধারণ ছাত্ররা এই চাল বুঝতে পেরে এবং নিজেদের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে সুশৃংখল এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং বিচার দাবী করে। কর্তৃপক্ষ বিচার করার নাম করে অহেতুক কাল কাটাতে থাকে এবং যেখানে চড় মারার কারণে ২৪ ঘন্টারও কম সময়ে টি,সি দেয়া হয়েছিল সেখানে ১২ দিন কেটে গেলেও পরের পরিকল্পিত আক্রমণের বিচার তারা করেননি এবং ১২ দিনের মাথায় ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় ইন্সটিটিউট বন্ধ এবং হল খালি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সমগ্র জাতির কাছে আমাদের প্রশ্ন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে কি এতখানি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলেই যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই যে কাউকে টি,সি দিতে পারেন, কিম্বা ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন?

এমনিতেই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলো দেশের সেশন জটের সবচেয়ে বড় শিকার, যা তিন বছর থেকে চার বছরের দিকে পা বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ তিন বছরের কোর্সে পড়ার জন্য ভর্তি হয়ে একজন ছাত্রকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে ক্লাস শুরু হবার। এর পরিণতি কি সেটা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। এর পরেও যদি কর্তৃপক্ষের টনক না নড়ে তাহলে ৪/৫ বছর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কাটানোর পর এ পথ ছেড়ে হয়ত নতুন পথের সন্ধানে যেতে হবে আমাদেরকে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের
জনৈক ভুক্তভোগী ছাত্র।

মাস্টার্স পরীক্ষা পিছানো হোক

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সালের এম,কম, শেষ পর্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরীক্ষার্থী। ইতিপূর্বে ১৫ই আগষ্ট আমাদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে তা ২৫শে অক্টোবর তারিখে নেয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময়সূচীও দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা পিছানো হোক সেটা আমরাও চাই না। কারণ পরীক্ষা পিছাবার সাথে সাথে চাকরির বয়সও একটু একটু করে কমতে থাকে, যা কোন অবস্থাতেই আমাদেরও কাম্য নয়। কিন্তু এগুলো জানা ও বোঝার পরও এবার আমরা তা দাবী করছি। সর্বনাশা বন্যাই যত নষ্টের মূল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের খুব কম জায়গাই আছে যা বন্যার কবলে পড়েনি। কম-বেশী সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবারকার বন্যায় যেখানে মাথা গুজবার ঠাই পাওয়া যায়নি সেখানে আবার পড়াশোনা হয় কি করে? শুধু মফস্বলই নয়, খোদ ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও এবার বন্যায় ছাড়েনি। যার ফলে বিশ্-